3.3-Research Publication

3.3.2 Number of books and chapters in edited/books published and papers published in national/international conference procedings per teacher during last five year.(2018-2023)

Sl No	Name Of Teacher	Department Of the Teacher	Name Of Journal	Title Of Paper	Title Of Book	Name Of The Publisher	Year Of Publication	Link To Website Of The Journal	ISSN Number	ISBN Number	Pear List Journal (Yes/No	Individual Or Jointly	URL
1	Bablu Naskar	History		Portugues-Muggs-Firingee Janajati O Sundorbons	Banglar Puratatta Itihas O Sahityo Probondho Mala	Banglar puratatta prakasana	February 2020			978-81-94729-5-9		Individual	

Principal
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogiballala, Baruipur, Kol.-145

বাংলার পুরাতত্ত্ব

ইতিহাস ও সাহিত্য প্রবন্ধমালা

৪

প্রথম খণ্ড

বাংলার পুরাতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র
কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারত

Scanned by CamScanner

Itihas O Sahityo Probondhomala - 4 (Part I)

A Collection of Peer Reviewed Research Articles

Collection of Research Articles presented at the
5th International Conference of Banglar Puratattva Gabeshana Kendra
held at Indian Council For Cultural Relations, Kolkata
on 1st September, 2019

ISBN : 978-81-947292-5-9

© বাংলার পুরাতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৩শে মাঘ, ১৪২৭ (৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১)

প্রকাশক
বাংলার পুরাতত্ত্ব প্রকাশনা
১১৭, খান মহম্মদ রোড, দক্ষিণ বেহালা
কলকাতা - ৭০০০৬১

বর্ণসংস্থাপন
পানীন্দ্র সাধুখাঁ
মো : ৭৯৮০১৫৫৭৫০ / ৯৪৩৩৬০৭০১৩

মুদ্রণ
এস. জে. প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য
৫০০/-টাকা মাত্র

২০২১

Scanned by CamScanner

পর্তুগীজ-মগ-ফিরিঙ্গি জনজাতি ও সুন্দরবন

বাবলু নস্কর*

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নদী লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মোহনাঞ্চল তথা বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ভূমির বিস্তৃত অংশ সুন্দরবন। যার পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা নদীর জলধারা প্রবাহিত। এই সকল নদ-নদীর প্রবাহমান ধারায় আণীত পলি ও সঞ্চিত ভূমিভাগে গঠিত সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪ পরগণার বিস্তৃত ভূ-ভাগ। প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে ভৌগোলিক কারণে গড়ে ওঠা এই ভূ-ভাগ এই ধরিত্রির বৃহত্তম ব-দ্বীপ যা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বা Gangetic Delta নামে বিশ্বে পরিচিত। অসংখ্য নদ-নদী-খাড়ি বেষ্টিত ও দ্বীপমালায় আবিষ্ট এই সুন্দরবন একাধিক জনগোষ্ঠী সমন্বিত। বঙ্গদেশের এই নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখন সমৃদ্ধ জনপদ, আবার কখনও গভীর অরণ্যাবৃত অনাবাসযোগ্য জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে। আর প্রকৃতির এই উত্থান-পতনের আপন খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিবিধ জনগোষ্ঠীভুক্ত দেশজ ও বিদেশিজ মানবের দুর্বৃত্তপরায়ণ কার্যকলাপ, যা এই অঞ্চলের জনজীবনকে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলেছিল এবং স্বাভাবিক ছন্দকে বিনষ্ট করেছিল।

সুন্দরবন অঞ্চল তথা নিম্নবঙ্গীয় সভ্যতার সমাজ-সংস্কৃতিক অঙ্গনে যে সকল বিদেশিজ মানব জাতির আগমন ও তাদের বহমান দুবৃর্ত্তপূর্ণ জীবন ধারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যা বিপর্যস্ত করেছিল স্বাভাবিক জনজীবনকে, তারই অন্যতম ছিল মগ-ফিরিঙ্গি-পর্তুগীজ জনজাতির ধূমকেতুর মত আবির্ভাব। ভারতীয় ভূখণ্ডের পূর্ব প্রান্তীয় প্রদেশ জল-জঙ্গলপূর্ণ ও অসংখ্য নদীনালা বেষ্টিত বঙ্গীয় সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল এই দুর্বৃত্তপরায়ণ দস্যুপনার এক অনন্য লীলাভূমি। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ নাগাদ এই দীর্ঘ সময়কাল এই সকল জনগোষ্ঠী ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল প্রান্তিক মানুষের স্বাভাবিক জীবনশৈলীকে, জনশূন্য করে তুলেছিল বিস্তৃত ভূখণ্ডকে। দূরন্ত ও দ্রুতগামী নৌচালনায় পারদর্শী এই দুর্ধষ্য জাতিগুলি মনুষ্যপূর্ণ এই অঞ্চলকে পরিণত করেছিল জলাভূমি বেষ্টিত অরণ্যভূমে। কৃষিক্ষেত্র থেকে বাণিজ্যকেন্দ্র, পরিবার থেকে প্রতিবেশী, গৃহান্তর থেকে বর্হিবাটী, নদী-সমুদ্র তীরভূমি থেকে কোলাহলপূর্ণ মানব ভূমি কোনওটাই তাদের তাণ্ডবলীলার বাইরে ছিল না। আকস্মিক আগমন, লুণ্ঠন, বন্দী মানুষকে জলযানে পূর্ণ করে বহিঃবাণিজ্য কেন্দ্রে বিক্রয়সাধন ছিল তাদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও অর্থাগমের মূল উৎস। এই সময়কালীন এই অঞ্চলের মানব জাতির উপর ছিল যেন বিশ্বমাতার এক চূড়ান্ত অভিশাপ।

এই লুণ্ঠনকারি, জনজীবন ব্যতিব্যস্তকারী বিদেশাগতরা ছিল পর্তুগীজ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমস্বার্থান্বেষী বঙ্গের পার্শ্ববর্তী এশিয় ভূখণ্ডিক অরাকানবাসী। যারা 'মগ' নামে পরিচিত। এদের সম্মিলিত পাশবিক কার্যকলাপে 'মগের মুলুক' নামে পরিচিত ভূ-ভাগ ছিল সদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত। তৎকালীন আরাকান ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত, বর্তমানে আরাকান চট্টগ্রামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র। একটি পর্বতমালা এই রাজ্যের পূর্ব সীমাকে ব্রহ্মদেশ থেকে পৃথক করে দিয়েছে, আর পশ্চিম সীমার সর্বত্র বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত জলরাশি প্রসারিত। পর্বতসংকুল ও সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এই ভূ-ভাগ ছিল দুর্গম ও সুরক্ষিত, নৌবিদ্যায় ছিল এরা ভীষণ দক্ষ। অন্য কারোর পক্ষে এদেশ জয় করা ছিল দুঃসাধ্য। যে কারণে এই ক্ষুদ্রজাতি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রায় চার সহস্র বৎসর ধরে তাদের অবাধ স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়েছিল। রামাবতী ছিল তাদের রাজধানী, যার বর্তমান নাম সান্দোবয় (Sandoway)। এখন আরাকান নিম্নবঙ্গের একটি বিভাগ এবং এর প্রধান নগরী — আকিয়াব। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত আরকানীদের হিংসা ও দস্যুতাই ছিল জীবনসঙ্গী।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত থেকে আগত পর্তুগীজরা আরাকান, চট্টগ্রাম ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে বসতি স্থাপন করেছিল। পশ্চিম ভারতের বোম্বাই ছিল পর্তুগীজদের প্রধান আস্তানা।

*পি.এইচ.ডি. গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner

অপরাধী পর্তুগীজরা গোয়া সরকারের শাস্তি এড়াবার জন্য নৌপথে এসে আশ্রয় নিত এই সকল মগ পরিবেষ্টিত অঞ্চলে। সেখান থেকে এই সকল দুর্বৃত্তপরায়ণ মানুষজন এসে ভিড় জমাত বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে মগেরা এই দস্যুপনা গ্রহণকারী পর্তুগীজদের আশ্রয় দিয়েছিল, কারণ মগরাও ছিল সমগোত্রীয়, সমজীবিকাধারী। তারা তৎকালীন বিপরীত শক্তি যথা বঙ্গের শাসক পাঠান বা মোগলদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের মানসে জোটশক্তি গঠনের জন্য তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। যদিও তাদের মধ্যে চিরকাল সুসম্পর্ক বজায় ছিল না, তা থাকারও কথা নয়। তা সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলার শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়লে পর্তুগীজ দস্যু ও মগদের অত্যাচারের সীমা চরমে পৌঁছেছিল এবং দক্ষিণ বাংলা জুড়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল।

পর্তুগীজরা ছিল ইউরোপের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য পর্তুগালের অধিবাসী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ নরপতি মানুয়েলের রাজত্বকালে ভাস্কো-দা-গামা স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কার করেন এবং সেই পথ ধরে তাঁর স্বজাতীয়রা (পর্তুগীজরা) বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারের কাজে অবতীর্ণ হয়। অল্পকালের মধ্যে গোয়া নগরীতে দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করে বাণিজ্যে প্রয়াসী হলেও গোয়া সরকার কর্তৃক আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গের দিকে অগ্রসহ হয়। ভাস্কো-দা-গামা বঙ্গে না এলেও তৎসম্বন্ধে লিখে যান। বঙ্গকে তখন বলা হত 'ভারতের ভু-স্বর্গ' (Paradise of India)। মোগল সানন্দাদিতে বঙ্গদেশ এই নামে পরিচিত ছিল।[১] বাণিজ্যের লোভে এদেশে এলেও অন্য কারণে বঙ্গদেস তাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বঙ্গ হল এমন একটি জায়গা যেখানে নৌবিদ্যা দক্ষতা প্রদর্শনের যথেষ্ট প্রসার আছে, দুঃসাহসিক অভিযানের বিশেষ সুযোগও আছে, এখানে বীরত্ব দেখালে রাজ্য জয় হয়, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করলে অর্থলাভ হয় এবং ধন ও জীবন নিয়ে পলায়ন বা বসতি স্থাপন উভয়ই সহজ সাধ্যময়। তাই এই দেশটি ছিল তাদের কাছে জাতীয় প্রতিভা ও প্রকৃতির অনুকূল। অনুরূপ ভাষ্য ক্যামপস-এর পর্তুগীজ ইন বেঙ্গলে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "In a labyrinath of revers the adventures could dive and dart, appear and disappear ranage the country and escape with impunity. Hence Bengal has been the victim of exploits and deparadations of foreign and native adventures alike".[২]

এই পর্তুগীজরা ভারতীয় জনমানসে কখনও হার্মাদ, কখনও বোম্বেটে, কখনোও বা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিতি পায়। পর্তুগীজদের নৌবহরের নাম আরমাডা (Armada), যার অপভ্রংস হল হার্মাদ। আর এর থেকে এদেশীয় মানুষজন পর্তুগীজদের 'হার্মাদ' বলত।[৩] দুঃসাহসিক বঙ্গীয় বণিকগণের কাছে 'রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতে বোম্বে অঞ্চলে যে সকল পর্তুগীজ বাস করত তাদের মধ্যে অনেকে ছিল দুর্বত্তপরায়ণ ও গুরুতর অপরাধী। তারা গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের হস্তে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে বঙ্গে পলায়ন করেছিল। বোম্বে অঞ্চল থেকে এসেছিল বলে ইই জাতির লোকেরা সাধারণত 'বোম্বেটে' নামে পরিচিত। এদেশে দস্যুবৃত্তিই তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল, তাই দস্যু বুর্বৃত্তদেরকে এদেশে এখনও বোম্বেটে বলা হয়। প্রথমদিকে আরকান ও চট্টগ্রামের উপকূলের নানা স্থানে আস্থানা ছিল, পরবর্তীকালে তারা বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সন্দ্বীপে অগ্রসর হয়েছিল। সন্দ্বীপ ছিল উৎপন্ন শস্য ও পণ্যের স্বর্ণদ্বীপ[৪]। ফ্রেডরিক নামক একজন ভিনিসীয় পর্যটক ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপ পরিদর্শন করেন এবং তিনি বলেন তখন এটি ছিল উর্বর জনবহুল সমৃদ্ধ দ্বীপ। ডু-জারিকের ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ থেকে জানা যায় সন্দীপ লবণের ব্যবসায় ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বছর দুই শতাধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করার জন্য এখানে উপস্থিত হত। সন্দ্বীপের এই সমৃদ্ধির কারণে মগ, পর্তুগীজ, মোগল বা ভুঞারাজগণের লোলুপ দৃষ্টি ছিল এবং বরাবর সন্দ্বীপের কূল রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে আগমন কালে পর্তুগীজদের অনেকে স্বদেশ থেকে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আনতে পারত না।

১. Hill, S. C., Bengal in 1756-57, Vol-III, P-160

২. Campos, Portuguese in Bengal, P-24

৩. মিত্র, সতীশ চন্দ্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৩৬ (J.A.S.B., 1907, No. 6, P-425 note)

৪. 'The Island was one of the most fertile places in World, Densely populated and well cutlvated'. – Noakhali Gazetter (Webster), P-17

Scanned by CamScanner

তাই সুযোগ পেলে বা যুদ্ধবিগ্রহ কালে তারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করত। অবশেষে গোয়া নগরী অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশক্রমে গোয়ার শাসনকর্তা অ্যালবুকার্ক পর্তুগীজদের এদেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি দেন। তবে তারা উচ্চ বংশীয় স্ত্রীগণকে সংযোগে যে বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, তারা 'ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিত হয়।[৫] তবে এ সম্পর্কে ক্যামপস-এর 'পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে বলা হয়েছে : Frank is the Parent word of Feringhi by which name the India-born Portugueses are steel known. The Arabs and Persians called the French Crusaders Frank, Ferang a Corrputation of France. When the Portuguese and other Europeans cane to India, the Arabs applied to them the same name Ferang, and then Feringhi[৬] মগ ও পর্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তান এখনও বঙ্গদেশে পরিপূর্ম। ফিরিঙ্গিদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪ পরগণার উপকূলে, নোয়াখালিতে, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে, বরিশালে, গুনশাখালি, চাপালি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, খাপড়াডাঙ্গা, মগপাড়া, প্রভৃতি স্থানে অগণিত, ঢাকায় ফিরিঙ্গি বাজার, তা ছাড়া কক্সবাজারে ও সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহনায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙ্গি বসবাস করছে।[৭]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে বাংলায় আগত বিদেশীয়দের অন্যতম হল পর্তুগীজ। তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন হুসেন শাহ। পর্তুগীজদের মধ্যে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কোয়েল হো (Coelho) চট্টগ্রামে আসেন। পরের বৎসর সিলিভিরা উপস্থিত হন আরকানে। প্রায় প্রতি বৎসর তাদের তরণী পণ্য বোঝাই করে বঙ্গে আসত। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডে মেলো (De Mallo) দুর্বৃত্তের কারণে ধরা পড়ে গৌড়ে দীর্ঘকাল বন্দী ছিলেন। মামুদ শাহের রাজত্বকালে (১৫৩৭-৩৮) মোগল সম্রাটের সনদ নিয়ে তারা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের আদেশ পায়। তাদের কাছে এই দুটি স্থান ছিল যথাক্রমে বড় বন্দর (Porto Grand) ও ছোট বন্দর (Porto Pequeno)। বর্তমান হুগলীর অন্তর্গত সপ্তগ্রাম ছিল তাদের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। পরবর্তীকালে বাণিজ্য পথের অন্যতম মাধ্যম সরস্বতী পলি জমে অগভীর হয়ে পড়ায় জাহাজ চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং ১৫৭৯ সালে বন্দরকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলী তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাকে বলা হত ছোট বন্দর[৮]। হুগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পেড্রো ট্যাভরিস। তখন থেকে বন্দরটি ব্যাণ্ডেল বন্দর নামে পরিচিত হয়। পর্তুগীজরা নৌবাহিনীর পক্ষে নিরাপদ বন্দর স্থানকে বলত ব্যাণ্ডেল। বাংলায় পর্তুগীজদের এরূপ বেশ কয়েকটি ব্যাণ্ডেল ছিল। আজকের ব্যাণ্ডের সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

র‍্যাফল ফিচ (Ralph Fitch) ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। তখন হুগলীতে পর্তুগীজদের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন[৯]। ১৫৮৩ থেকে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিনসাটেন (Van Linschoten) নামক পর্যটক ভারতে ছিলেন। তাঁর বিবরণে জানা যায় হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজদের অবস্থান ছিল, কিন্তু সেখানে তাদের কোন দুর্গ বা শাসন শৃঙ্খলা ছিল না। তারা সেখানে বিশৃঙ্খলভাবে বাস করত। তারা স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় কেউ কারোর শাসন মানত না। তারা নানারকম অপরাধের অপরাধি বলে একস্থানে তাদের পক্ষে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করার সাহস হত না।[১০]

তবে অনতিকাল পরে তারা হুগলীতে দুর্গ ও স্থায়ী আবাসস্থল নির্মাণ করে। এখানে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ উপনিবেশ। তা সত্ত্বেও কিন্তু তাদের চরিত্রগত প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। যার জন্য হুগলী ও তার প্রান্তিপার্শ্বিক জনপদে চলছিল নানারকম পীড়ন ও বিরাজ করছিল বিবিধ অত্যাচার। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান মানুষজনের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক ও কর আদায়, জোর করে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিতকরণ, নারী অপহরণ, নরনারী ও শিশুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

৫. মিত্র, সতীশ চন্দ্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৩০
৬. Campos, Portuguese in Bengal, P-47 note.
৭. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড ৭৯৭
৮. Bengal past and present, part-II, P-1616
৯. Fitch, Ralph, England's Pioneer to India, Ed. By J. H. Riley, 1899, P-628
১০. Bengal past and present, part-I, 1915, Pp-80-81

Scanned by CamScanner

চট্টগ্রাম ছিল পর্তুগীজদের অন্যতম উপনিবেশ। এই চট্টগ্রাম ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজ্যের অধীন হয়ে পড়লে পর্তুগীজদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। আরাকান রাজের সহিত পর্তুগীজদের সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। যে কারণে তারা দলে দলে চট্টগ্রামে এসে বাস করতে থাকে এবং এখানকার রমনী গ্রহণ করে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে। অবশেষে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তারা অস্ত্রবলে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। যদিও চট্টগ্রাম দখল করার পূর্বেই তারা পাহাড়তলির নিকট একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেছিল। তাছাড়া কর্ণফুলি নদীর মোহনার অপর পারেও ডিয়াঙ্গা (Dianga) নামক স্থানে বসতির জন্য একটি বড় শহর স্থাপন করেছিল। ডিয়াঙ্গা ছাড়াও আরও কয়েকটি স্থানে পর্তুগীজদের প্রধান উপনিবেশ ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল রামু[১১] (Ramu)। সম্ভবত এর পূর্ববর্তী নাম ছিল রামাবতী। তবে ডিয়াঙ্গাই যে তাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভ্রমণকারী ম্যানরিক এই ডিয়াঙ্গা থেকে রামুতে এসেছিলেন[১২]। ১৫৯৯ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই স্থানে একটি গীর্জাও তারা নির্মাণ করেছিল।

[Father Brabe, viear of Chittagong, wrote on Sept, 05, 1853 : 'the first church (of the portuguese on the chittagong side) was built by them at Deang (Dianga) which is at the mouth of the river][১৩]

এই সময় বঙ্গদেশে বারোভূঁইয়াদের শাসনধীন ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁরা বিশেষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। বারোভূঁয়াদের অন্যতম ছিলেন প্রতাপাদিত্য। তিনি যশোহরকে কেন্দ্র করে রাজ্যপাঠ শুরু করেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তাঁর রাজ্যের সুস্থিতি রূপায়নের জন্য একাধিক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। মনি নদীর তীরে বাঁশড়ার ঘুঁটিয়ারী শরীফের কাছেও প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। এটি মাতলা দুর্গ নামে পরিচিত। দুর্গাধিপতি ছিলেন হায়দার মানকসি, পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে হায়দার আবাদ নামকরণ হয়। বিদ্যাধরী নদীর পশ্চিম তীরে উত্তর মাকালতলা নামক একটি গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামের দমদমা নামক স্থানে অজস্র লোহা লক্কড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় অনেকে মনে করেন এখানে রাজা প্রতাপের অস্ত্রনির্মাণ কারখানা অথবা দুর্গ ছিল। তিনি মগ-ফিরিঙ্গি ও পর্তুগীজদের অত্যাচার দমন করার জন্য এই দুর্গগুলি নির্মাণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটলে (১৬১০ খ্রীঃ) অরক্ষিত সাগরদ্বীপের উপর ফিরিঙ্গিদের অধিকার স্থাপিত হয়। তাদের তাণ্ডবলীলায় ও অত্যাচারে স্থানীয় জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, আরাকান রাজের সহায়তায় পর্তুগীজরা সাগরদ্বীপে ১৬৩২ খ্রীঃ একটি দুর্গও নির্মাণ করে। প্রতাপাদিত্য যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দস্যুদের উৎপাত দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে সিবাষ্টিন গঞ্জেলিস নামক এক দুর্দান্ত নায়কের নেতৃত্বাধীনে আবার ফিরিঙ্গিরা ভীষণ তাণ্ডবলীলা শুরু করে। ম্যানরিকের বিবরণ থেকে জানা যায় এই তাণ্ডবলীলা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল স্থায়ী হয়েছিল[১৪]।

এককালে ফিরিঙ্গিদের নৌবাহিনী বা আর্মাডা থাকত সাগরদ্বীপের পূর্বদিকে প্রবাহিত বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা নদীতে। এখান থেকে তারা নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চলের নদী তীরবর্তী জনপদগুলিতে এই সকল নৌযানের মাধ্যমে হামলা ও লুণ্ঠন চালাত। সেই কারণে বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা নদী বহুকাল দুর্জনদের নদী নামে পরিচিত ছিল[১৫]।

ইতিপূর্বে কাশিম খাঁ হুগলীকে পর্তুগীজদের হাত থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। তৎকালীন মোগল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশক্রমে তিনি ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান এবম প্রায় তিন মাস যুদ্ধের পর কাশিম খাঁ হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। বহু পর্তুগীজ সৈন্য মারা যায়। কয়েক হাজার পারদর্শী নৌ-সৈনিক

১১. Chittagong Gazetteer, P-188
১২. ibid, Pp-167-77
১৩. Bengal past and present, 1916, part-II, Pp-261-62
১৪. L.S.S.O. Malley, Bengal District Gazetter, South 24 Parganas, P-360
১৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, পৃ-২২৫

Scanned by CamScanner

বন্দি হয়। এবং চার শত পর্তুগীজ নরনারীকে বন্দি করে দিল্লিতে পাঠানে হয়। এই অভিযানে একাধিক পর্তুগীজ জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মাত্র কয়েকটি রণতরী নিয়ে এই প্রতিমা পূজক ফিরিঙ্গিরা আহত ও নিদারুণ রূপে অপমানিত হয়ে সাগর দ্বীপে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তার মধ্যে ছিল পাদরী ক্যাবরল এবং তিন হাজার পর্তুগীজ নরনারী। সেখানে আবার মহামারি দেখা দিলে তারা হিজলিতে নিজেদেরকে স্থানান্তরিত করে এবং সেখান থেকেই নদীপথে দস্যুবৃত্তি চালাতে থাকে[১৬]। তবে এই ঘটনার বহু পূর্ববর্তী সময় থেকেই সুন্দরবন অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগরদ্বীপ, কুলপী, তাড়দহ প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজদের আস্থানা ছিল। কাসিম খাঁ হয়ত হুগলীতে পর্তুগীজ শূন্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় তখন পর্তুগীজরা যথারীতি বসবাস করছিল। অসংখ্য নদ-নদী ও দুর্গম অঞ্চলের কারণে তাদের অবস্থান ছিল বিশেষ সুরক্ষিত। তাদের অনেকেই প্রতাপাদিত্যের জোত সংরক্ষণ, গোলন্দায় সৈন্য ও নৌবাহিনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, যারা হলেন পর্তুগীজ ফ্রেডারিক ভুডলী, ফ্রানসিসকো রড্ডা, এবং আগস্টান পেড্রো।

সুন্দরবনাঞ্চলের সাগরদ্বীপ ছিল মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দুর্গ ও নৌঘাঁটি। এখানে জাহাজ নির্মাণ কারখানাও ছিল, এই কারখানায় প্রচুর সংখ্যক ফিরিঙ্গি কর্মচারী কাজ করত। রাজধানী ধুমঘাট যাওয়ার জলপথ নিয়ন্ত্রিত হত ফিরিঙ্গিদের দ্বারা, তাই এই জলপথ ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি নামে পরিচিত ছিল[১৭]।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্পর্কের অবনমন ঘটে। এবং আরাকান রাজ তার রাজ্য থেকে পর্তুগীজদের নিঃশেষ করার আদেশ দেন। সেই সময় তারা অতিশয় দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে। এই চরম অত্যাচারকে নির্মূল করার জন্য তৎকালীন সন্দ্বীপের শাসনকর্তা ফতে খাঁ যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস নামক এক পর্তুগীজ নেতার নেতৃত্বাধীনে জলদস্যুগণ ফতে খাঁর সহিত প্রবল যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি ও তাঁর সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করে সন্দ্বীপ দখল করে নেন এবং গঞ্জালেস সন্দ্বীপের রাজা হন। সেখান থেকে তারা মুসলমানদের একে বারে নির্মূল করে দেয়।

১৬১০ খ্রীঃ পুনরায় পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে পর্তুগীজ নেতা গঞ্জালেসকে সঙ্গে নিয়ে আরাকান রাজ বঙ্গদেশের লক্ষীপুর পর্যন্ত দখল করেন। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ সেনাপতি ডন ফ্রান্সিসকে নিহত ও গঞ্জালেসকে বিতাড়িত করে অরাকানরাজ সন্দ্বীপ দখল করে নেন (১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তা প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সায়েস্থা খাঁ আরাকান রাজকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হন। তাঁর সেনাপতি ওমদে খাঁ ও হুসেন বেগ চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করে মোগলদের নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। উল্লেখ্য আরাকান রাজের পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীতে অনেক পর্তুগীজ সেন্যও ছিল। কিন্তু তাদের কোন বেতন দেওয়া হত না। তারা আরাকানরাজের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশকে জায়গিরস্বরূপ ধরে নিয়ে সারাবৎসর ব্যাপী অত্যাচার, হরণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে রত থাকত।

ইসলাম খাঁ পর্তুগীজদের অত্যাচারকে অনেকাংশে নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মগ ও পর্তুগীজদের দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজধানীকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। তৎপূর্বে প্রতাপাদিত্য সন্দ্বীপের শাসনকর্তা কার্ভালোকে কৌশলে ডেকে এনে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন তাতে পর্তুগীজদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল এবং বহু পর্তুগীজ পাদ্রী এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

পর্তুগীজ ও মগেরা সয়েস্তা খাঁর অভিযানে (১৬৬৬) যেভাবে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়েছিল তাতে পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গিগণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। লৌকিক কথায় এই পলায়নের নাম 'মগ-ধাওনি'। মগেরা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সংগৃহীত দেববিগ্রহ ও অতুল ঐশ্বর্য মাটির নীচে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। আরাকানে গিয়ে তারা এ সকল গচ্ছিত ধন ও দেবমূর্তি প্রোথিত করার স্থানগুলিকে এক সাঙ্কেতিক মানচিত্রে লিপিবদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে দেশে শান্তির পরিবেশ ফিরে এলে মগ পুরোহিতরা মানচিত্র হস্তে ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হয়ে

---

[১৬] চৌধুরী, কমল, চব্বিশ পরগণা : উত্তর ও দক্ষিণ সুন্দরবন, পৃ-৫১

[১৭] মিত্র, সতীশচন্দ্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৯

Scanned by CamScanner

সেই গুপ্ত দেববিগ্রহ ও মনিমুক্তাদি মৃত্তিকাগর্ভ থেকে তুলে নিয়ে যেত। এখনও নাকি সেই ধারা অব্যাহত আছে, মাঝে মাঝে মানচিত্র হস্তে মগ পুরোহিতদের দেখা মেলে[১৮]।

নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে এই দুঃসঙ্কল পর্তুগীজ-মগ-ফিরিঙ্গিরা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। বিশেষত বর্তমান বরিশাল, খুলনা ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ ছিল এদের প্রধান লীলাক্ষেত্র। বার্নিয়ের ভ্রমণ কাহিনীতে বলা হয়েছে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ সমুদ্র পথে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হত অথবা ছোট ছোট দ্রুতগামী জলযান নিয়ে নদী-নালার মধ্য দিয়ে শতাধিক মাইল পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। সেখানকার শহর, বাজার, লোকালয় বা কোনও উৎসবাদির সন্ধান পেলে গিয়ে আক্রমণ চালাত, যা পেত তা লুঠপাট করে নিয়ে যেত আর যা নিতে পারত না তা সব আগুনে পুড়িয়ে দিত। এভাবে তারা যেখানে সেখানে প্রবেশ করত এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করে বঙ্গের শান্ত পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করার উপক্রম দেখিয়েছিল। এভাবে গঙ্গার মোহনার একাধিক জনবহুল দ্বীপ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। এবং সেখানে স্থান লাভ করেছিল ব্যাঘ্রাদিসহ একাধিক বন্য জীবজন্তু ও বিস্তৃত গহন অরণ্যানি। তাদের আক্রমণের সময় যাদ্ধরত্না পালাতে পারত তারা বেঁচে যেত আর যারা ধরা পড়ত তাদের অবস্থা হয়ে উঠত শোচনীয়। বন্দি সামর্থ পুরুষদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে নিজেদের সঙ্গে দস্যু ব্যবসায় নিয়োজিত করত। আর অবশিষ্টদেরকে দাক্ষিণাত্য, সিংহল ও অন্য দেশের বন্দরে নিয়ে গিয়ে দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। তমলুক ও বালেশ্বরে বিক্রি করত দাস-দাসি। এই সময় অবিবাহিত মহিলাদের চুরি করে পাত্রী হিসাবেও ব্যবহার করা হত। মুসলমান মহিলাদের পরিচয় গোপন করে হিন্দু পুরুষদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত। কবি গঙ্গারাম তৎকালীন হার্মাদদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস যজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন[১৯] :

আশ্বিন মাসে ভাস্বর গেল পলাইয়া।
চৈত্র মাসের পুনরূপি আইল সাজিয়া।।
জেই মাত্র পুনরূপি ভাস্বর আইল।
তবে সর্দার সকলকে ডাকিয়া কহিল।।
স্ত্রী-পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলোয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা।।
এতেকর বচন যদি বলিল সরদার।
চর্তুদিকে লুটে কাটে বোলে মারমার।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রী হত্যা সত সত কৈল।।

শুধু তাই নয়, তারা সাধারণ মানুষকে জোর করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত। তারা গর্ব করে বলতো যে, মিশনারীগণ দশ বৎসরের চেষ্টায় যা না পারতেন হার্মাদরা এক বছরে তার থেকে বেশি মানুষকে খ্রীষ্টান করতো। মগদের তাণ্ডব ও অমানুষিক আচরণে মোগল বণিকরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন[২০] "মোগল বণিকেরা মগদিগকে এত ভয় করিত যে বহু দূর হইতে চারিখানি মগের জাহাজ দেখিলে একশত মোগল পোত থাকিলেও মোগল বণিকেরা কোনো প্রকারে প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিলেই সাহস ও বীরত্বের জন্য প্রশংসিত হইত। আর যদি হঠাৎ মোগল ও মগ পোত কাছাকাছি আসিয়া পড়িত, তবে মোগলেরা অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিত এবং ডুবিয়া মরাকেও বন্দিত্ব অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া মনে করিত।"

মানরিকের বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে, ১৬২৯-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ ও মগ দস্যুরা বাংলাদেশ থেকে আঠারো হাজার মানুষকে বন্দি করে দিয়াঙ্গা ও আরাকানে বিক্রি করেছিল। চট্টগ্রাম থেকে হুগলী পর্যন্ত কোন স্থানই তাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিল না[২১]। যশোহরের উপর যেন তাদের উৎপাত সবচেয়ে বেশি

১৮. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ-৮ ১১-১৬
১৯. জলিল, মহম্মদ আব্দুল, বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, পৃ-৬২
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন, মধ্যযুগে বাঙ্গালা, পৃ-৯২-৯৩
২১. Bengal past and present, 1916, part-II, P-258

Scanned by CamScanner

ছিল। এখানে যশোহর বলতে যশোহর রাজ্য বা খুলনার দক্ষিণাংশকে বুঝতেহবে। গোয়ার বাজারে বাঙালী মেয়ে বিক্রি হতেও দেখেছিলেন পর্তুগীজ পর্যটক পিরার্ডডালাভাল। হিন্দু-মুসলমান যে জাতিরই লোক হোক না কেন, কেউই রেহাই পেতনা। এইভাবে দেখা যায় ১৬২১ থেকে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চট্টগ্রামে একুশ হাজার মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের পর বন্দি মানুষদের হাতের পাতায় ছেঁদা করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে দিত। তারপর তাদেরকে জাহাজের পাটাতনের নীচে একটির উপর একটি স্তূপীকৃত করে নিয়ে যেত। আর সকালে বিকালে পাখির খাদ্যের ন্যায় শুধুমাত্র কিছু চাল তাদের মুখের কাছে ছড়িয়ে দিত। এরপরও যারা জীবিত থাকত তাদেরকে তমলুক, বালেশ্বর প্রভৃতি বন্দরে নিয়ে গিয়ে বিদেশি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিত। তাদের এই নির্মম অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের জনপদগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল গভীর অরণ্যাঞ্চল। বিদেশী পর্যটক বিশেষত বার্নিয়ের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলায় পর্তুগীজ দস্যু বা ফিরিঙ্গি এবং আরাকানের মগরা একসঙ্গে অত্যাচার চালাত। তবে ফিরিঙ্গিরা বন্দিদের বিক্রি করত দাস হিসেবে আর মগরা তাদেরকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করত।

বার্নিয়ের লিখেছেন : "বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এসে শায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজটি হল, বাংলা দেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। একাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকর্তা বিখ্যাত মীরজুমলা কেন গ্রহণ করেন নি, তা তিনিই জানেন। শায়েস্তা খাঁ যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে হলে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা থাকা দরকার। বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্য বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা ঔপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই শুধু খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু তাদের মত জঘন্য পিশাচ প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সবসময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগধের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুঠতরাজ ও অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল। এই সময় গঙ্গার অসংখ্য শাখানদী ভিতর দিয়ে ঢুকে গিয়ে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তারা ক্রীতদাস করার জন্য বন্দি করে নিয়ে যেত। উৎসব পার্বনের দিনও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কতশত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশূন্য করেছে তার হিসেব নেই। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয় শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছে"[২২]।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী রেনেলের মানচিত্রে সুন্দরবনের একটি অঞ্চলকে "Country depopulated by the Muggs" বলে চিহ্নিত করা হয়। বর্নিয়ের বিবরণে তার সমর্থন মেলে। তাছাড়া সতেরো আঠারো শতকে এসব অঞ্চলে আইনের শাসন বলে কিছুই ছিল না। সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতার ফলেই সৃষ্টি হয় 'মগের মুলুক' শব্দটি। নবাব আলিবর্দি খাঁ আঠারো শতকে কুলপিতে দেড়শত সিপাই রেখেছিলেন ফিরিঙ্গিদের জন্য, কিন্তু নিম্নবঙ্গের সাগর তীরবর্তী এলাকা অত্যন্ত দুর্গম ছিল তাই তা বিশেষ কার্যকর হয়নি। নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চলে মগ-ফিরিঙ্গিদের অমানুষিক কার্যকলাপ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাদের দস্যু বৃত্তিতে ধরা পড়লে বিশেষত নারীরা তাদের স্বাভাবিক জীবন ও ধর্ম ত্যাগে বাধ্য হত। তারা জঘন্য পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে থাকত। এমনকি মগ-ফিরিঙ্গি আক্রমণ কালে পালাবার সময় কোনও নারী ধৃত বা স্পর্শিত হলেই তাকে সমাজ বর্জিত বা জাতিচ্যুত করা হত। এভাবে দুর্ভাগ্যবশে বা অরক্ষিত অরাজকতা পূর্ণ দেশের দোষে তারা চিরকালের পতিত ও অপবাদ গ্রস্থ হয়ে থাকত। এই কলঙ্ককে 'ফিরিঙ্গি বা মগো পরিবাদ' বলা হত। তৎকালীন কৌলিক সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ পরিবাদ গ্রস্ত পরিবার চিহ্নিত হত বিবিধ নামে। যথা — মগো-ব্রাহ্মণ, মগো-বৈদ্য, মগো-কায়েত, মগো-নাপিত প্রভৃতি। এভাবে মগ-ফিরিঙ্গিদের স্পর্শদোষ

[২২] ঘোষ, বিনয়, বাদশাহী আমল পৃ-৬৬-৬৭

Scanned by CamScanner

জনিত কারণে সৃষ্টি হয়েছিল এ স্বতন্ত্র সমাজ। এই সমাজটি 'মগদোষ' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখনও যমুনা, সরস্বতী, ভৈরব বা মধুমতীর কূলেতো বটেই এমনকি যশোহর, ফরিদপুর, অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা বিশেষত সুন্দরবনাশ্রিত বিভিন্ন জনপদের একাধিক স্থানে মগো-পরিবাদগ্রস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্ত, বৈদ্য প্রভৃতি নানা মানুষের বসবাস আছে[২৩]।

এভাবে দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান মখিরা, নগরা, মগুখালি, মগপাড়া প্রভৃতি তাদের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত খুলনা ও চব্বিশ পরগণার সমুদ্রকূলের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক মগ-ফিরিঙ্গি বা তাদের যৌন সম্পর্কজাত শঙ্করজাতিও বাস করছে। নোয়াখালিতে হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ। সুন্দরবনের হরিনঘাটার মোহনার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে বহু মগ পল্লীর অবস্থিতি বিদ্যমান। এই সকল বহু বিচিত্র মানবজাতির আগমন ও প্রত্যাগমন এবং তাদের নিরন্তর কার্যকলাপের একান্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই দ্বীপভূমি সুন্দরবন।

---

[২৩] মিত্র, সতীশ চন্দ্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৩৪

Scanned by CamScanner